চিত্রকলায় মুক্তিযুদ্ধ

আমি, মুক্তিযুদ্ধ এবং শিল্পকলা

রফিকুন নবী

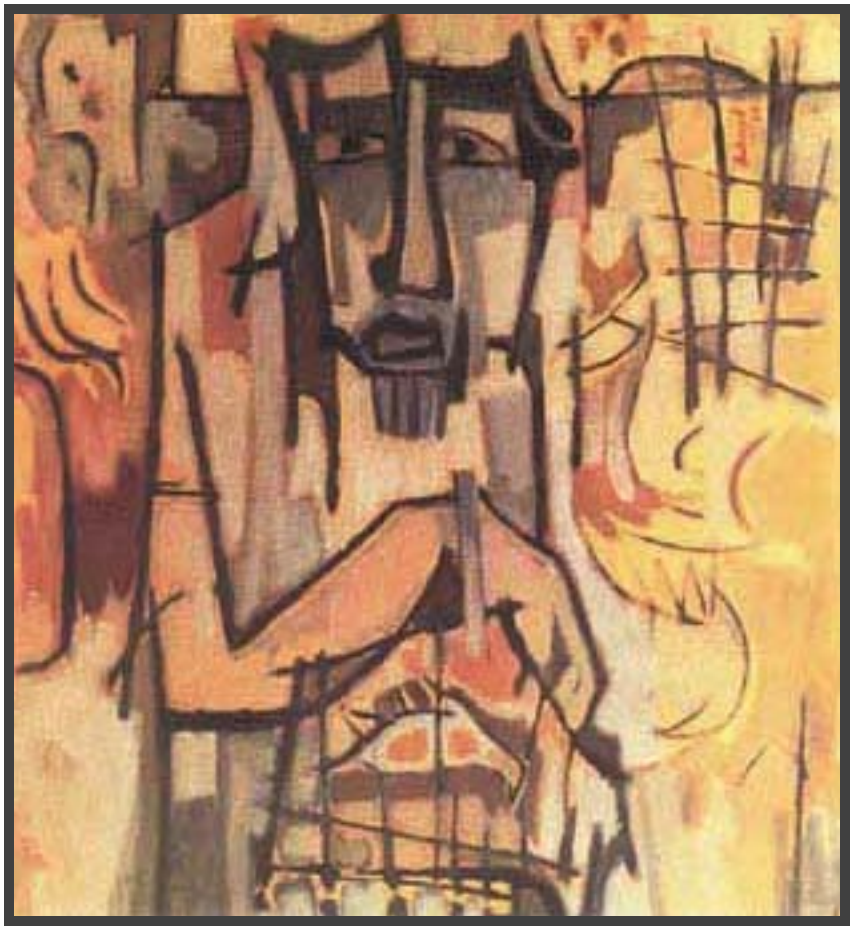

সফিউদ্দিন আহমেদ *'একাত্তরের স্মৃতি'* তেলরং

মোহাম্মদ কিবরিয়া *'একাত্তরের স্মৃতি'* মিশ্রমাধ্যম

যুদ্ধকে নিয়ে অথবা যুদ্ধকালীন বিষয়-আশয়কে নিয়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টি সহজ নয় মোটেও। কারণ যুদ্ধ মানুষকে অস্বাভাবিকতায় ঠেলে রাখে। তখন ভাবনাগুলোকে শুধুমাত্র নান্দনিক রশি দিয়ে বেঁধে রাখার উপায় থাকে না। কারণ যুদ্ধ ব্যাপারটির সাথে ভয়, মৃত্যু, হত্যা, ভয়াবহতা, নৃশংসতা, অমানুষিকতা, অমানবিকতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি বহু 'অ্যান্টি আর্ট' বিষয় আর ঘটনা জড়িত থাকে ওতপ্রোতভাবে। কিন্তু আবার এর উল্টো পিঠে থাকে বেঁচে থাকার জেদ, জয়ী হবার প্রত্যয় বীরত্ব, মাতৃভূমির প্রতি টান। নিজ গন্ডি, ভাষা আর সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরার চেতনা।

তবে দু'পিঠই ইচ্ছেটাকে যুদ্ধে গিয়ে অস্ত্র ধরার দিকেই ধাবিত করে বেশি। আমারও সেই ইচ্ছেটাই প্রকট ছিলো। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। রয়ে গিয়েছিলাম দেশেই।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় আমাকে ঢাকায় থাকতে হয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সরাসরি যোদ্ধা হতে যাবার সমস্ত আয়োজন করেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের কারণেই রয়ে যেতে হয়েছিলো খোদ ঢাকাতেই। ঢাকায় বিভিন্ন অপারেশনে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনেই আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন দু'নম্বর সেক্টরের হাবিবুল আলম, শহীদুল্লাহ খান বাদল, ফতেহ চৌধুরী, চুল্লু, শাহাদত চৌধুরী, আবুল বারক আলভীসহ বেশ ক'জন দুঃসাহসী তরুণ। বলা বাহুল্য, সময়ের চাকায় পড়ে অনেকের নাম এখন আর স্মরণে নেই।

শুধু আমি নই, যাওয়া হয়নি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ, শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, শিল্পী আনোয়ারুল হক, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, কাজী আবদুল বাসেত, সৈয়দ শফিকুল হোসেন, হাশেম খান প্রমুখেরও। রয়ে গিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অনেক প্রবীণ শিক্ষক এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবা-দিক, যাঁরা আমাদের খুব ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। রয়ে গিয়েছিলেন কবি শামসুর রাহমান, জাহানারা ইমাম, এখলাসউদ্দিন আহমেদ, সঙ্গীত শিল্পী আলতাফ মাহমুদসহ আরো অনেকে।

তখন শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের বেশির ভাগ মানুষ কলকাতায় চলে যাওয়ায় ঢাকায় এই অঙ্গনটি প্রায় ফাঁকাই হয়ে গিয়েছিলো। অতএব কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও ছিলো না। যারা

মনিরুল ইসলাম *'রক্তাক্ত একাত্তর'* জলরং

শাহাবুদ্দিন আহমেদ *'মুক্তিযোদ্ধা'* তেলরং

রয়ে গিয়েছিলাম– তারা প্রায় একটি গোষ্ঠীর মতই হয়ে গিয়েছিলাম বলা চলে। খুবই সাবধানতায় পরস্প-রের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং মুক্তিযোদ্ধা-দের জন্যে নানাবিধ সহায়তা দেয়াই ছিলো তখন আমাদের প্রধান কাজ। ঠাঁই দেয়া থেকে শুরু করে ওষুধপত্র, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করে রাখা, এমনকি অস্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখার মত বিপজ্জনক কাজগুলো খুবই সাবধানতার সঙ্গে সমাধা করতে হতো দেশে রয়ে যাওয়া দলকে। বলা বাহুল্য, পুরো ব্যাপারটি ছিলো অত্যন্ত বিপদের। খ্যাতিমান সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব, গণসঙ্গীতের অকুতোভয় জনপ্রিয় শিল্পী আলতাফ মাহমুদকে তো প্রাণই দিতে হয়েছিলো এ জন্যে।

প্রতি মুহূর্তে উৎকণ্ঠা আর উদ্বিগ্নতায় কাটানো সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে নিজেদের সৃষ্টিশীল কাজ চালিয়ে যাবার মতো স্বাভাবিক মানসিকতা তখন ছিলো না। চারদিকে পাকসেনা, সরকারি গুপ্তচর, অনুচর, রাজাকার, আলবদরসহ পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থনকারী অমানুষদের এড়িয়ে চলার দুর্বিষহ জীবন তখন। সেই পরিস্থিতিতে শিল্পকর্মে যুদ্ধভিত্তিক দুঃসাহসী কিছু করা তো বটেই, সাধারণ ছবি আঁকাও ছিলো আত্মঘাতিকতার শামিল।

কিন্তু তারপরও অনেকেই মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করতেন নিজ নিজ মাধ্যমে কাজটি করে যাওয়ার। কিন্তু তেমন বোধগম্য চিত্রকলা বা ভাস্কর্য তো দৃশ্যমান জিনিস। অতঃপর বড় আকারে তো বটেই ক্ষুদ্র পরিসরে করলেও তা বিপজ্জনক ছিলো ঐ পরিবেশে। তবুও মন বলে কথা। ইচ্ছা দমন সম্ভব হয়নি এক পর্যায়ে এসে। অতএব শিল্পীরা চুপেচাপে ছবি আঁকার চেষ্টা করতেন যেমন তেমনি কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের ক্ষেত্রে। শামসুর রাহমান সেই সময় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন। শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ এঁকেছিলেন 'দেখা' নিয়ে আঁকা চোখের চিত্রমালা।

হাতের কাছে রঙ-তুলি-ক্যানভাসকে কতক্ষণ আর মেলে রাখা যায়, ভাবনা-চিন্তাগুলো প্রতিনিয়ত ছবি আঁকার দিকে যেন ধাবিত করে। আমিও মে মাসের দিকে ঠিক করলাম ছবিতে হাত দেবো। ঘরে বড়সড়ো একটি ক্যানভাসও স্ট্রেচ করা ছিলো। যুদ্ধ শুরুর মাস ছয়েক আগে আমার এক সহপাঠী কমিশন পেয়েছিলেন আদমজী পাট কলের কিছু ছবি আঁকার। একটি 'বার্ডস্-আই ভিউ' ছবি আঁকার অংশটি আমাকে করে দিতে অনুরোধ জানিয়ে ক্যানভাসটি দেয়া হয়েছিলো। আলসেমি করে সেটি করা হয়নি। সমাপ্ত করার জন্য খুব জোর তাগাদাও ছিলো না। তারপর তো দেখতে দেখতে ভোট এলো। ভোটের পর স্বাধিকার আন্দোলন। এবং সব শেষে এলো মুক্তিযুদ্ধ। তখন তো অত্যাচার নিপীড়ন আর গণহত্যার ব্যাপারগুলো উল্লাসে পরিণত হয়েছে পাকিস্তানিদের। অতএব আমাদের সীমাহীন দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তায় সুকুমার ভাবনা-চিন্তাসমূহ দিশেহারা। মনের ইচ্ছা– যে, গণহত্যা আর নির্যাতন-নিপীড়ন নিয়ে প্রতিবাদী কিছু করি। কিন্তু তার পরিণামের কথা ভেবে তেমন প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আবার আধুনিক ধরন-ধারণের প্রলেপে খুবই বিমূর্তে কিছু করাও ওই সময়ে নিরর্থক মনে হয়েছে।

অতএব আমি একটি প্রতীকী ছবি আঁকার চেষ্টা নিলাম। আমার মন বলছিলো বিজয় মুক্তি সমাসন্ন, স্বাধীনতা একেবারেই হাতের কাছে। ব্যাপারটি আঁচ করার সূত্র ছিলো মুক্তিযোদ্ধারা। তারা ঢাকায় এসে অপারেশন চালাতো আর আশু জয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে যেতো। পাকিস্তানিদের দোর্দন্ড প্রতাপ যে ক্রমশ ঢিলে হয়ে আসছে সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে তা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণী খবরাখবর থেকে বুঝতে পারছিলাম।

বিজয়ের আনন্দকে নিয়ে ছবি শুরু করেছিলাম মে মাসের মাঝামাঝিতে। বিজয়ের প্রতীক হিসেবে নিয়েছিলাম ক্যানভাস জুড়ে বিস্তৃত রাজকীয় একটি হস্তি। তার পিঠে আনন্দিক মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা। তাদের হাতগুলো আকাশের দিকে উত্তোলিত। ক্যানভাসে দেশের প্রতীক হিসেবে দু'হাত বাড়ানো মা। মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু। বলা বাহুল্য, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কোনো অস্ত্র আঁকিনি। কাজটি করেছিলাম অবোধ্য রাখতে। পুরো ছবিটি আঁকতে ইচ্ছে করেই সময় নিয়েছিলাম বেশি।

মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী, হাবিবুল আলম, ফতেহ আলী, শহীদুল্লাহ খান বাদল, চুল্লু প্রমুখ এলেই ছবিটি দেখতে এবং আমার

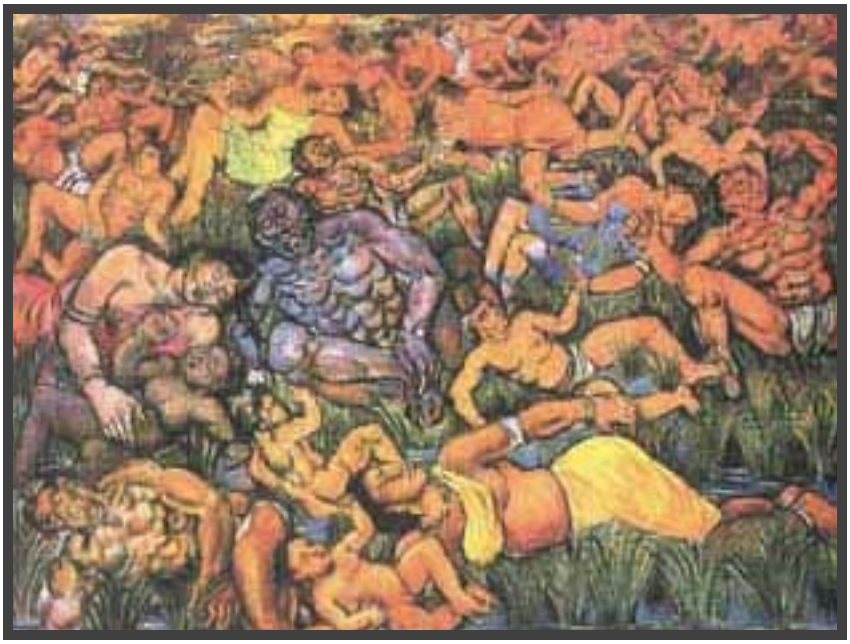

এস এম সুলতান *'হত্যাযজ্ঞ'* তেলরং

ইচ্ছার কথা শুনে মজা পেতো। ইচ্ছাটি ছিলো যে– হাতির পিঠের ঘরেফেরা মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তোলিত হাতে অস্ত্রগুলি আঁকা হবে বিজয় হলেই। অর্থাৎ স্বাধীন হলেই। আগে আঁকলেই মুক্তিযোদ্ধা বোঝা যাবে বলে ব্যাপারটি উহ্য রেখেছিলাম। এবং একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই (যদিও আগের রাতে অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর রাত ১১টার দিকে শুরু করে মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করে) ছবিটি শেষ করেছিলাম। ছবিটি এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রয়েছে।

ছবিটি বড় মাপের কিছু হয়নি তা আমি অকপটে স্বীকার করি। না আঙ্গিকগত, না আঁকার ব্যাপারে শৈলীগত, না পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত– কোনো উল্লেখ করার মত কিছু হয়নি। নেহাত একটি সাধারণ স্টাইলে রাখার চেষ্টায় করা প্রতীকী ছবি। কিন্তু তৈলচিত্রটি আমার অত্যন্ত প্রাণপ্রিয়। কারণ আজও মনে হয় যেন ফাঁসির আসামির ডেথ সেলে বসে মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে শেষ ইচ্ছা পালনের মতো একটি কাজ।

স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে অনেক ছবিই এঁকেছি। হয়তো আঙ্গিক, শৈলী, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি দিক অনেক জোরালো হয়েছে, কিন্তু সেই ছবিটিই আমার মনে গাঁথা, অন্যগুলো নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভাবতাম– স্বাধীন হলে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে খুবই বাস্তবধর্মী করে ছবি আঁকবো প্রাণ ভরে। প্রতিভাই ছিলো বলা চলে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বিষয় বাছাই করতে গিয়ে যেসব ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনার ছবি মনে ভেসে উঠেছিলো, সেসব ভয়াবহ ঘটনা নিয়ে বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার আর রুচি হয়নি। নির্যাতনের দৃশ্য, ধর্ষণের দৃশ্য, হত্যার দৃশ্য, শকুনে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাওয়া গলা-পচা লাশের দৃশ্যগুলোকে শিল্পকর্মে ফটোগ্রাফির মতো করে উপস্থিত করতে মন সায় দেয়নি। শুধু আমি নই, বহু শিল্পীই ঐসব ভয়াবহ আর মন খারাপ করা নৃশংস এবং অশ্লীল দৃশ্যগুলোকে সত্যিকারের মত করে ছবিতে উপস্থিত করা থেকে বিরত থেকেছেন, এড়িয়ে গেছেন। এমনকি জয়নুল-কামরুলও। তবে অন্য আঙ্গিকে, আধুনিকতা আশ্রিত প্রতীকী ধরনে শিল্পীরা পরবর্তীতে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রকলায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন কাইয়ুম চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন এবং ভাস্কর্যে আবদুর রাজ্জাক, হামিদুজ্জামান খান এবং আবদুল্লাহ খালেদ।

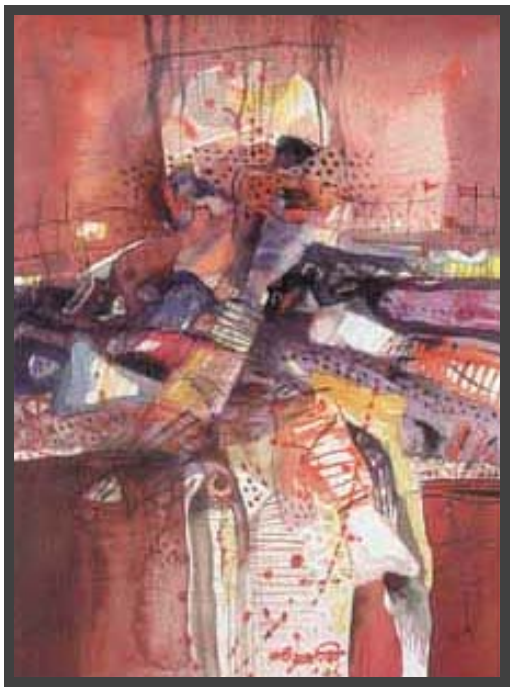

রফিকুন নবী *'স্মৃতি '৭১ : বধ্যভূমি'* জলরং

অনেককেই আক্ষেপ করতে শোনা যায় যে, শিল্প-সাহিত্যে আজও পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে নিযে বড় মাপের কোনা কাজ হয়নি। এ ক্ষেত্রে 'বড় মাপ' বলতে 'কালজয়ীতা' সেই ধারণায় রাখা হয় বলে আমার বিশ্বাস। ব্যাপারটি সত্যি বটে। যে অর্থে ব্রুসেল, ইরোনিমাস বা ফ্রান্সেসকো গইয়ার 'এক্সিকিউশন' পাবলো পিকাসোর গয়ার্নিকা, জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা কিংবা কামরুল হাসানের কার্টুন পোস্টার ইত্যাদি কালজয়ী, তেমনটা ঘটেনি, ঘটছে না।

অবশ্য এও ঠিক যে, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিল্পকলার কলেবর তেমন ব্যাপক নয়। যে হারে স্বাধীনতার পর শিল্পকলা চর্চা হয়েছে এবং এতো বছরে সেই চর্চার গতিময়তায় আমাদের প্রবীণ-নবীন শিল্পীদের কাজ এবং কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে যে শিল্প রূপের প্রাপ্তি ঘটেছে সেই ব্যাপকতায় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিল্পকর্মের অবস্থান নিতান্তই চুল পরিমাণ।

তবু গর্ব করেই বলা যায় যে, দেশের সব শিল্পীই মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ছবি এঁকেছেন, ভাস্কররা ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন, এখনও করেন। এমনকি একাত্তরের পরের প্রজন্ম– যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তারাও তা নিয়ে শিল্পকর্ম রচনা করে যাচ্ছে নিজ নিজ মাধ্যম আর আঙ্গিকে সাজিয়ে। কিন্তু সেই যে কথা– 'বড় মাপের কাজ' বলে স্বীকৃতি পাবার মত ঘটনাটি ঘটছে না।

বড় মাপের কাজে বিষয় গ্রহণে, মাধ্যম বাছাইতে, রঙের গুণে, মানে, রসে, রুচিতে, ধরনে, আকারে, বক্তব্য প্রকাশে, মোক্ষম বিন্যাসে একযোগে অসাধারণত্বের ছোঁয়া থাকলে তবেই তা বড় মাপের হয়। হয়তো তা হয়েছে আমরা তেমন করে ধর্তব্য জ্ঞান করিনি কিংবা হয়তো ভবিষ্যতে হবে। এ নিয়ে নৈরাশ্যজনিত আক্ষেপ বা অভিযোগের কিছু নেই। স্বাধীনতা আমাদের এতো বিশাল একটি প্রাপ্তি যে, তাকে নিয়ে এবং তাকে যে রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধটি উপহার দিয়েছে তা নিয়ে কালজয়ী শিল্পকলা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন রচিত হবে। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব বলে কিছু নেই। নেপোলিয়নের রাশিয়া দখলের যুদ্ধ শেষ হবারও বহু বছর পর (প্রায় ষাট) যুদ্ধের ভয়াবহতাকে, ঘটনাপ্রবাহকে স্মৃতিতে রেখে লিও টলস্টয় তার কালজয়ী উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। অতএব, আমরা সেই আশায় থাকবো। আসলে যুদ্ধের ঘটনা ইতিহাসবন্দি। সেই ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়।